পাহাড়ের পথে

সমীরকুমার ঘোষ

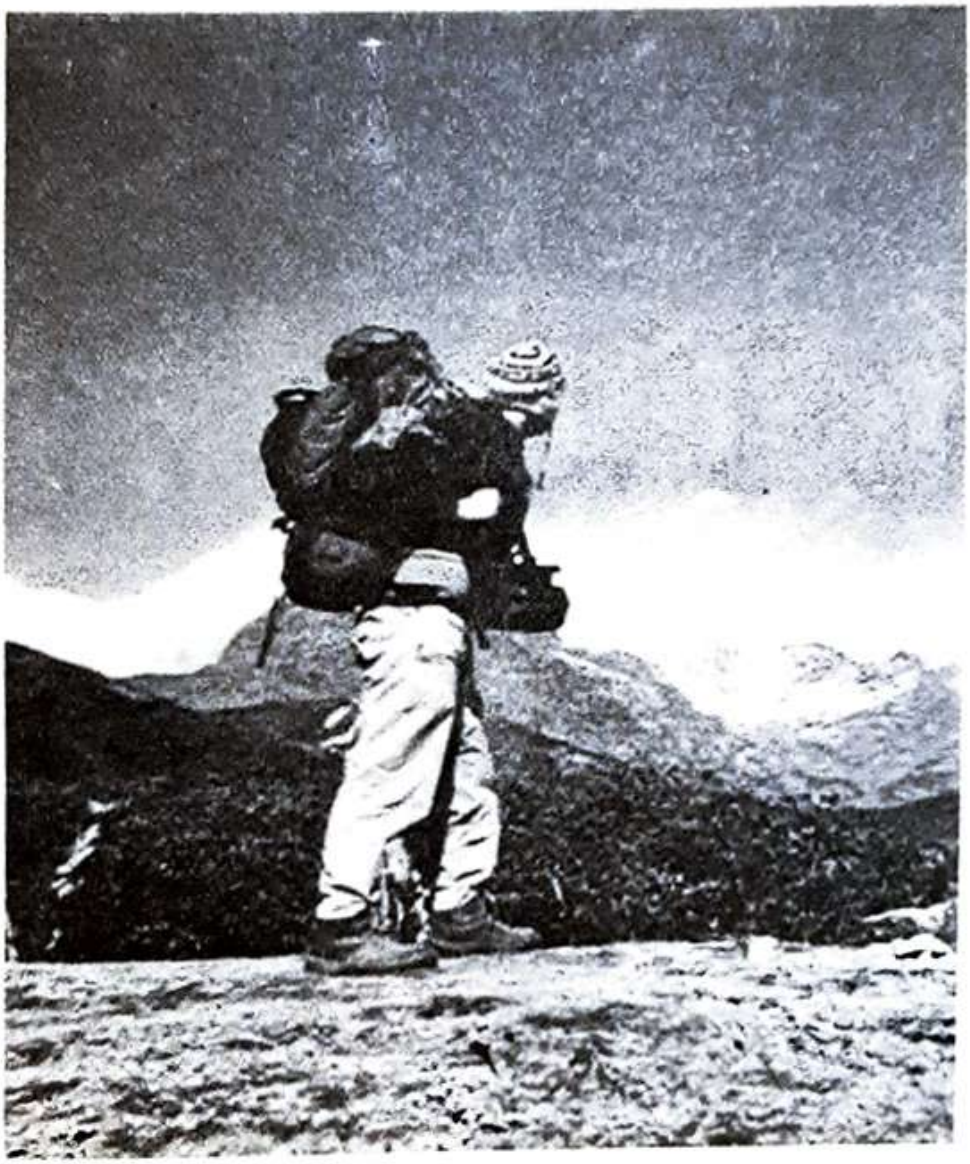

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

শুভেচ্ছা

দেবতাত্মা হিমালয় ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং অধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই নগপতিকে অবলম্বন করে ভারতে এক বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। এবং ইদানীংকালে বোধ করি বাংলার হিমালয় সাহিত্য অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার হিমালয় সাহিত্য থেকে সমৃদ্ধতর। আর তারই ফলে একালের হিমালয় যাত্রায় বাঙালি যাত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

একালের হিমালয়যাত্রা মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত — তীর্থযাত্রা, শৈল শহর দর্শন, পদযাত্রা বা ট্রেকিং এবং পর্বতারোহণ। তীর্থযাত্রা সুপ্রাচীন, শৈলশহর দর্শন শুরু হয়েছে ব্রিটিশ যুগ থেকে এবং বলা বাহুল্য, ট্রেকিং এবং পর্বতাভিযানও পাশ্চাত্য অভিযাত্রীদের অবদান। হিমালয় দর্শন মানেই আনন্দলাভ। তার মধ্যে পদযাত্রা বা ট্রেকিং-এর আনন্দ সীমাহীন। কারণ দুঃখ, কষ্ট ও নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে যাত্রীরা দুর্গম ও দুস্তর হিমালয়ের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আসেন।

ইদানীংকালে বাঙালি যাত্রীরা অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় পদযাত্রা বা ট্রেকিং-এ অংশগ্রহণ করছেন। এটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরব ও গর্বের কথা। কারণ হিমালয় ভারতের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী সম্পদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, হিমালয় সম্পর্কে এখনও আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমিত। অতএব হিমালয়কে আমাদের জানতে হবে, তাকে আবিষ্কার করে তার সম্পদ আহরণ করতে হবে। এজন্যই দুর্গম ও দুস্তর হিমালয়ের আনাচে-কানাচে প্রচুর পদযাত্রার প্রয়োজন।

আনন্দের কথা, সমীরকুমার ঘোষ সেইসব দুঃসাহসী পদযাত্রীদেরই একজন। হিমালয়ের নেশায় আক্রান্ত হয়ে তিনি বহুবার হিমালয়ের পথে পাড়ি দিয়েছেন কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেননি। তাঁর সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার কথা তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

সেই-সব যাত্রাকাহিনীর বারোটিকে নিয়ে প্রকাশিত হল এই সংকলন। সহজ ও সরল ভাষায় এই প্রাণময় কাহিনীগুলি পাঠক-পাঠিকার অন্তর স্পর্শ করবে। এবং আমার বিশ্বাস, এই সংকলনটি বাংলা হিমালয়-ভ্রমণসাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন রূপে গৃহীত হবে। আমি লেখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে তার কাছ থেকে আরও হিমালয় সংকলনের প্রত্যাশায় রইলাম।

৫২এ বাবুবাগান,
কলকাতা - ৩১

শম্ভু মহারাজ

সূচিপত্র

- মণিমহেশের পথে ৯
- নীলকণ্ঠ ও ত্রিশূল তীর্থের পদতলে ১৬
- তমসা উপত্যকার পথ ধরে ২৬
- কুমায়ুনের কুয়ারিতে ৩৩
- পিণ্ডারী ও কাফনির উৎস সন্ধানে ৪২
- অন্নপূর্ণা পরিক্রমা ৪৯
- মুক্তিনাথের পথে ৫৯
- বরফে মোড়া চৌরিখিয়াং ৮১
- স্বপ্নসুন্দর কিয়াংজিন ৮৬
- অন্নপূর্ণার পদতলে ৯৪
- সিঙ্গলিলা গিরিপথ পেরিয়ে ১০৩
- একযাত্রায় পঞ্চকেদার দর্শন ১১৫

মণিমহেশের পথে

যে কয়টি হিন্দুতীর্থের পবিত্র ধূলি স্পর্শ করার জন্য পুণ্যার্থী নরনারীরা অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকেন, 'দ্বিতীয় কৈলাস' নামে খ্যাত শৈবতীর্থ মণিমহেশ নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। চাম্বা উপত্যকার মণিকৈলাস শৃঙ্গের পদতলে অবস্থিত এই অনন্য তীর্থক্ষেত্রটিতে শুধুমাত্র তীর্থলাভের আশাতেই নয়, এই তীর্থপথের অপরূপ নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের টানেও প্রতিবছর দলে দলে মানুষ পথের যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে ছুটে আসে এখানে। এসে তারা ধন্য হয়, তৃপ্ত হয়।

একটি সুন্দর গল্প জড়িয়ে রয়েছে এই তীর্থটিকে ঘিরে। একসময় সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাটি জর্জরিত হয়ে উঠেছিল বিধর্মীদের অত্যাচারে। সে-সময় দেবাদিদেব মহাদেব অমরনাথ ছেড়ে চলে আসেন মণিমহেশে। একদিন এক মেষপালক ভেড়া চরাতে চরাতে হঠাৎই দর্শন লাভ করে শিবের। শিব তাকে বরদান করে তাঁর এই অবস্থানের কথা কাউকে জানাতে বারণ করেন। এরপর দিন কাটে, মাস যায়, বছরও পার হয়। হঠাৎ একদিন এক পথিক এসে হাজির হয় এই পথে। মেষপালকের সাথে দেখা হলে সে তাকে কথায় কথায় শিবের অবস্থানের কথা বলে ফেলে। এমনকি পথিকটিকে সে শিবের আলয়ে পৌঁছেও দেয়। এই শর্তভঙ্গের অপরাধেই শিবের শাপে আজও নাকি এরা পাথর হয়ে রয়েছে মণিমহেশে। আর সেই থেকে প্রতিবছর জন্মাষ্টমী থেকে রাধাষ্টমী পর্যন্ত তীর্থযাত্রীর ঢল নামে মণিমহেশে।

এই সময় চাম্বার চর্পটনাথ মন্দির থেকে অমরনাথের ছড়ি মিছিলের মতো একটা মিছিল আসে এখানে। সে এক অসাধারণ নয়নাভিরাম দৃশ্য! সে-দৃশ্যের মধ্যে ফুটে ওঠে আবহমান ভারত-আত্মার এক চলমান জনজীবনের ছবি। দেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার নরনারী এই মিছিলে ছুটে আসেন। খোলা হয় লঙ্গরখানা, ফেলা হয় অস্থায়ী তাঁবু। মেলা বসে। সরকারি উদ্যোগে খোলা হয় মেডিক্যাল ক্যাম্প। সেই বহুকাঙ্ক্ষিত শৈবতীর্থ মণিমহেশের পথে যেতে আমরাও বেছে নিয়েছিলাম বছরের ঠিক ওই সময়টিকেই।

প্রথমেই আমরা গেলাম পাঠানকোটে। যদিও শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশন থেকে অনেক ট্রেনই যাচ্ছে পাঠানকোটে, তবে আমরা ধরেছিলাম রাত ১১-টার 'হিমগিরি' এক্সপ্রেস। দ্বিতীয় দিন পুরোটাই ট্রেনে কাটিয়ে তৃতীয় দিন দুপুর নাগাদ পৌঁছালাম পাঠানকোট। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে বাস ছাড়ছে ডালহৌসির। চটপট টিকিট কেটে উঠে বসলাম বাসে। তারপর পাঠানকোট থেকে ডালহৌসি প্রায় ৮০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে যখন গন্তব্যে পৌঁছালাম, তখন রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। সময় লেগেছে প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক।

বাস থেকে নেমে দেখি, বেশ জমজমাট এই এলাকাটি। সবরকমের হোটেলই রয়েছে এখানে। দেখেশুনে তারই একটাতে আশ্রয় নিলাম বাকি রাতটুকু কাটাতে।

পরদিন ভোরে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে ওক, পাইন ও দেবদারুতে ছাওয়া ডালহৌসির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অসাধারণ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! উত্তর জুড়ে তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী। একদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধৌলাধার, অপরদিকে কাশ্মীরের পীরপাঞ্জাল আর দক্ষিণে পাঞ্জাবের সমতলভূমি। এককথায় রূপসী ডালহৌসির রূপ অতুলনীয়। যেদিকে তাকাই, চোখ ফেরানো দায়। বহুক্ষণ ধরে এই অনির্বচনীয় রূপসুধা পান করতে সাধ হয়। আবার পরমুহূর্তেই মনে হয়, আমরা যে তীর্থ পরিক্রমায় বের হয়েছি, আগে তো তার ডাকে সাড়া দিয়ে আসি। তাই বেশি দেরি না করে একটু বেলা হতেই রওনা দিই। আজ আমাদের পৌঁছাতে হবে 'ভারমোর'।

বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে ৮টায়। চলার পথের দুধারে চোখে পড়ে সারি সারি পাইন ও দেওদারের ঘন জঙ্গল। কোথাও সুউচ্চ পর্বতমালা। কোথাও বা অগণিত ভুট্টার খেত। মৃদু হাওয়ায় দুলতে থাকে গাছগুলি। এভাবে দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে চাম্বা পেরিয়ে আমরা যখন ভারমোর পৌঁছাই, তখন সন্ধ্যা নামছে লাজুক পায়ে।

একটি ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই ভারমোরের সাথে। একসময় স্বাধীন চাম্বা রাজ্যের রাজধানী ছিল এই ভারমোর। তখন এর নাম ছিল 'ব্রহ্মপুর'। একসময় এই ব্রহ্মপুর বা ভারমোরেই চাম্বা রাজবংশের রমরমা ছিল অন্তত ৩০০ বছর। শোনা যায়, এই ভারমোরের পথে মিশে আছে ৮৪ জন মহাত্মার পুণ্য পদধূলি। পরবর্তী কালে এঁদেরই পুণ্য স্মৃতিতে রাজা সহলবর্মা গড়ে তুলেছিলেন ৮৪টি মন্দির, যা আজও 'চৌরাশি মন্দির' নামে খ্যাত। এখানকার সব মন্দিরই শিখরধর্মী ও শিল্পসুষমামণ্ডিত। তবে এদের মধ্যে লক্ষ্মণাদেবীর মন্দিরটিই তুলনামূলকভাবে সুন্দর। এগুলি ছাড়াও ৭০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি লিঙ্গরাজ মণিমহেশের মন্দিরও রয়েছে এখানে। তবে শুধু তীর্থমন্দিরের জন্যই নয়, প্রায় ৭,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ভারমোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অতুলনীয়। আর সম্ভবত সেই কারণেই একদা 'ভারতের সুইজারল্যান্ড' বলেও খ্যাতি ছিল ভারমোরের। থাকবারও কোনো অসুবিধে নেই এখানে। বেশ কয়েকটি ছোটো লজ তো রয়েছেই, এছাড়াও রয়েছে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ডরমিটরি, খুবই নামমাত্র ভাড়ায়।

পরদিন প্রভাত-সূর্যের স্নিগ্ধ আলো দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি আমরা। আজ আমাদের যেতে হবে 'হরসর' হয়ে 'ধনছো'। তবে হরসর পর্যন্ত জিপ ও বাস দুই-ই মেলে এপথে। জিপগুলি অনেকটা লরির ধাঁচের এবং হরসর পর্যন্ত যেতে ভাড়া নেয় মাথা প্রতি ১০ টাকা। জিপে উঠে মাত্র মিনিট ১৫ চলার পরই আমরা পৌঁছে যাই হরসর। এই হরসরই হল মণিমহেশের পথে শেষ গ্রাম। আর এখান থেকেই শুরু হল আমাদের হাঁটাপথ— চলতি কথায় আমরা যাকে বলি 'ট্রেকিং'। আবার এখান থেকে আমাদের সঙ্গীও বাড়ে একজন— ক্ষেম। আমাদের মালবাহক ও পথপ্রদর্শক।

তবে হ্যাঁ, পোর্টারের জন্য হরসর অবধি না এসে ভারমোর থেকে পোর্টার নেওয়াটাই সুবিধাজনক। কেননা ভারমোরেই পোর্টারদের সংখ্যাধিক্য এবং ওদের টাকার দাবিও হরসরের পোর্টারদের থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

এই হরসরেই সঙ্গে বয়ে আনা অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নামমাত্র ভাড়ায় একটি দোকানে গচ্ছিত রেখে পরম নিশ্চিন্তে আমরা বেরিয়ে পড়ি পথে। প্রায় ৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের তখন পৌঁছাতে হবে 'ধনছো'তে।

মণিমহেশের পথে

পথে নেমে প্রথম ১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করি অতি সহজেই। তারপরই শুরু হয় প্রাণান্তকর চড়াই। একটু উঠতেই হাঁফ ধরে যায়, এমন অবস্থা। তবুও পাথর-বিছানো পথ ধরে, কখনো বা পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে এগোতে থাকি আমরা। মাঝেমাঝেই পেরোতে হয় কর্দমাক্ত পথ। কয়েক জায়গা তো বেশ পিছল। সাবধানে পা না ফেললেই বিপদ। সন্তর্পণে এগোতে এগোতে আমরা যখন ধনছো গিয়ে পৌঁছাই, তখন দিবাকর তার অমিত তেজ নিয়ে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে। ক্লান্ত শরীরে আমরা আশ্রয় নিই একটা তাঁবুতে। আমাদের পাশ দিয়ে দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে 'অমরগঙ্গা'। নদীর ওপরই জায়গায় জায়গায় জমে রয়েছে গ্লেসিয়ার। নীচে বহমান স্বচ্ছ জলধারা। আপন ছন্দে ঢেউ তুলে সে ছুটে চলেছে ইরাবতী নদীর সাথে মিলনের আশায়। তাঁবুতে বেশ খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বাইরে এলাম। চারপাশের এই পরিবেশ, সৌন্দর্য দারুণ লাগে। দেখতে দেখতে কখন যে সময় কেটে যায়, বুঝতেই পারি না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠি। ৮টা! তার মানে এখন তো বেশ রাত! একবার ভাবি, ঘড়ি ঠিক আছে তো? সহযাত্রী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, আমাদের সময় অনুযায়ী এখন রাত ৮টাই, অথচ দিনের আলো ঝকঝক করছে চারধারে। সারাদিন হাঁটাহাঁটিতে ক্লান্ত শরীরটাকে বিশ্রাম দিতে খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলে বিশ্রাম নেওয়াই মনস্থ করি।

রাতের খাওয়া সারি তাঁবুর পাশে খোলা একটি লঙ্গরখানায়। বছরের এই নির্দিষ্ট সময়টিতে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লঙ্গরখানা খোলে তীর্থযাত্রীদের জন্য। সেখানে সকালের জলখাবার থেকে শুরু করে দুপুর ও রাতের আহার সবই পাওয়া যায় বিনা পয়সায়।

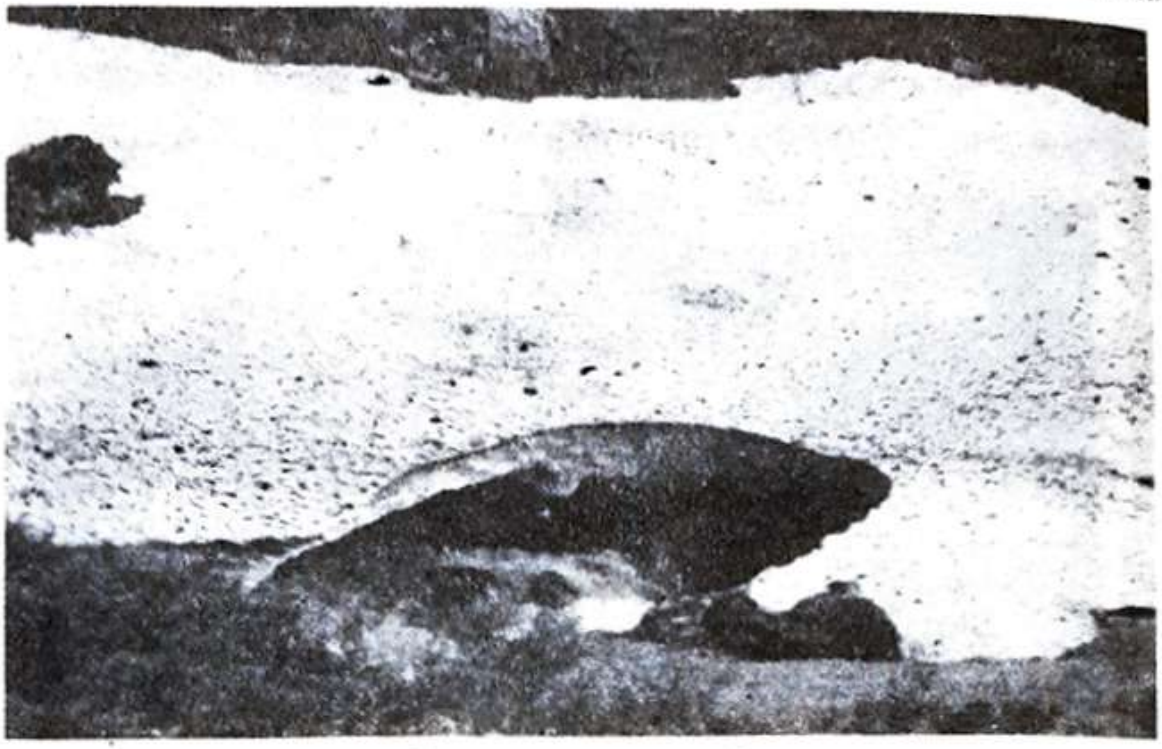

নদীর ওপর জমে থাকা গ্লেসিয়ার

সাদর আপ্যায়ন করে খাইয়েই যেন তৃপ্ত হয় এরা! খেয়েদেয়ে তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি, আমাদের জন্য লেপ, কম্বল, বালিশ সবকিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে। থাকবার জন্য ভাড়া ধার্য হয়েছে মাথা প্রতি ২০ টাকা। ক্লান্ত শরীরটাকে লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি খেয়াল থাকে না। হঠাৎ গায়ে জল পড়তেই চমকে উঠি। জেগে দেখি বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে, আর তাঁবুর কোনো গোপন ছিদ্র পেরিয়ে জল ঢুকছে ভিতরে। এই শীতে, এত রাতে এখন উপায়? না, সে-রাতে ঘুম আর হয় না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অবিরাম বর্ষণের শব্দ শুনতে শুনতে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকি।

শেষরাতে বৃষ্টি থামে। আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। যাক, ভোর হলে বের হওয়া যাবে তাহলে! তারপর যখন বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভোর হয়, তখন বাইরে এসে দেখি ঝকঝকে আকাশ। মনটা নেচে ওঠে আনন্দে। আর দেরি না করে তখনি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি পথে। আজ আমাদের পৌঁছাতে হবে গৌরীকুণ্ডে। পথ অবশ্য সামান্যই। মাত্র ৫ কিলোমিটার। ওখান থেকে মণিমহেশ আরো দেড় কিলোমিটার। অর্থাৎ সাকুল্যে সাড়ে ৬ কিলোমিটার। অনেকেই তাই সকালবেলা ধনছো থেকে রওনা দিয়ে গৌরীকুণ্ড হয়ে বেলাবেলি মণিমহেশ দেখে আবার ফিরে এসে রাত কাটান গৌরীকুণ্ডে। আমরা অবশ্য ঠিক করলাম, এদিন মণিমহেশ না পৌঁছে আমরা রাত কাটাব গৌরীকুণ্ডেই। মণিমহেশে পৌঁছাব পরদিন সকালে।

এবারেও পথে নেমে দেখি দুরন্ত চড়াই। পাকদণ্ডী পথ ওপরের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে গিয়েছে শুধু। একটু এগোতেই পড়ল একটি সাঁকো। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী। একবার পা হড়কালে আর রক্ষে নেই! তাই সন্তর্পণে সেই সাঁকো পার হই। চলার পথে মাঝেমাঝেই চোখে পড়ে, পাহাড় বেয়ে নেমে-আসা বিশাল গ্লেসিয়ার। নীচের দিকে কোথাও বা সৃষ্টি হয়েছে বিশাল গহ্বর। এগিয়ে চলার পথে সবসময়েই আমাদের সাথী অমরগঙ্গা। কখনো সে ডাইনে, কখনো বা বাঁয়ে। কখনো দেখি পথের দুপাশ রাঙিয়ে তুলেছে একরকমের হলুদ ও বেগুনি রঙের পাহাড়ি ফুল। এগোতে এগোতে একসময়ে এসে পড়ি

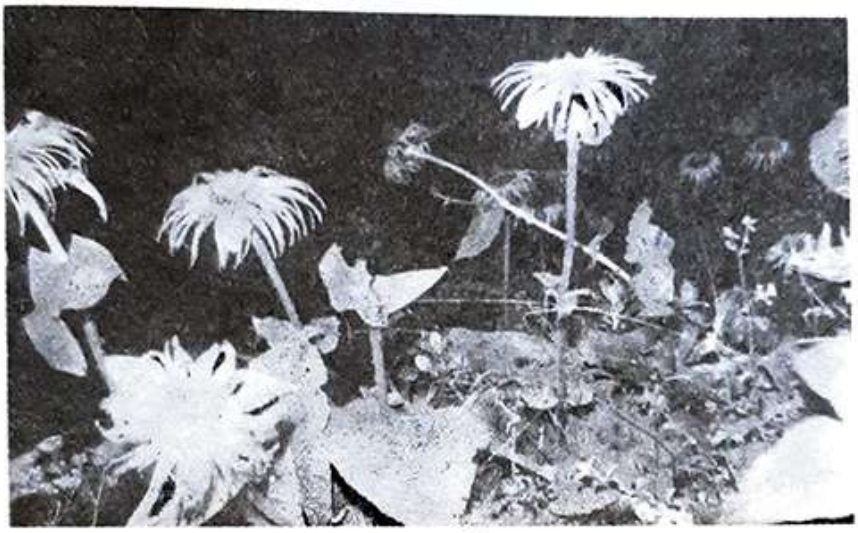

ধনছোর পথে ফুটে থাকা ফুল

ফুলে ছাওয়া এক বিশাল উপত্যকায়। মনে পড়ে যায় ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এর কথা। আরো খানিকটা চলার পর এসে পড়ি এক বিশাল গ্লেসিয়ারের সামনে। স্থানীয় লোকেরাই বরফ কেটে পায়ে চলার উপযোগী একটা পথ করে দিয়েছে মাঝখানে। সেই পথ ধরে সাবধানে

ধনছোর পথে কাঠের সেতু

এগোতে থাকি আমরা। তারপর চলতে চলতে দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছাই ১২,৬৩০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত গৌরীকুণ্ডে।